মুক্তকথা

একজন বাংলাদেশী হত্যারও প্রতিবাদ করতে পারে না সরকার

মঈনুল আলম

বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বিএসএফ'র বেপরোয়াভাবে গুলি করে বাংলাদেশী হত্যার ঘটনাগুলো অবশেষে ভারতেরই কোনো কোনো নেতার কাছে অসহ্য হয়ে গেছে বোঝা গেল যখন ভারতের রাজ্যসভার সদস্য মনিশঙ্কর আয়ার বললেন যে, বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ 'ট্রিগার-হ্যাপি' (গুলি চালাতে উল্লসিত) হয়ে পড়েছে।

বিএসএফ'র ট্রিগার-হ্যাপির বলি হতভাগ্য বাংলাদেশীদের মহাজোট সরকার কিন্তু তার নাগরিক হত্যার এমন কঠোর সমালোচনা তো দূরের কথা, একটি হত্যারও কোনো 'ফর্মাল প্রটেস্ট' (অফিসিয়াল প্রতিবাদ) ভারত সরকারের কাছে লিপিবদ্ধ করাতে পারেনি!

১৬ জুলাই কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতের সাবেক তেল-গ্যাসমন্ত্রী মনিশঙ্কর আরো বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের সমস্যাকে বিএসএফ 'বন্দুক দিয়ে সমাধান করতে চায় আর এতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে।'

সিলেট সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ'র একাধিক দফায় গুলিবর্ষণ, হামলা ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুলাই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী টুকু ও ভারতীয় হাইকমিশনার রজিত মিত্রের বৈঠকের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজশাহী সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে আরো একজন বাংলাদেশী নিহত হলেন!

এ লেখাটি শুরু করেছিলাম মহাজোটের ১৮ মাসের শাসনকালে বিএসএফ'র গুলিবর্ষণে মোট ২৮ বাংলাদেশী নিহত হওয়ার তথ্য উল্লেখ করে, আহতদের সংখ্যা ধরিনি। লেখার মধ্যপথে রাজশাহী সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে আরো একজন বাংলাদেশী নিহত হওয়ার সংবাদে নিহতের সংখ্যা ২৯-এ উঠল। পরিস্থিতিদৃষ্টে মনে হয়, এ লেখাটি প্রকাশ হতে হতে আরো দুয়েকজন হতভাগ্য বাংলাদেশী বিএসএফ'র গুলিতে প্রাণ হারাতে পারেন।

কানে বাজে বঙ্গবন্ধুর গম্ভীর নিনাদ, 'আর যদি একটি গুলি চলে...।' বঙ্গবন্ধুকে যে গভীরভাবে জেনেছিলাম, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি যদি আজ এ হতভাগ্য দেশে বেঁচে থাকতেন, তাহলে এই মারমুখী প্রতিবেশী দেশকে বিনা দ্বিধায় হুঁশিয়ারি দিতেন, 'আমার দেশের মানুষের ওপর যদি আর একটি গুলি চলে, তোমাদের (দেশের মানুষের প্রতি) প্রতি রইল...।' বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বানের চেতনা বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার প্রমাণ রেখেছে বিএসএফ'র আগ্রাসনের বলি সিলেট সীমান্তের বাংলাদেশী জনগণ।

গত ৫ মাসে সিলেটের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট উপজেলা সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র ১৭ দফা গুলিবর্ষণে ৬৩ জন বাংলাদেশী আহত হয়েছেন, আরো ১২ বাংলাদেশী আহত হয়েছেন বেসামরিক ভারতীয়দের গুলিতে। অপর এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, মহাজোটের ১৮ মাসের মহাশাসনকালে বিএসএফ'র গুলিবর্ষণে ২৯ বাংলাদেশী নিহত অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে গড়ে তিনজন করে বাংলাদেশী প্রাণ দিয়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিএসএফ বাংলাদেশীদের লক্ষ্য করে তাদের টার্গেট শুটিং প্র্যাকটিস করছে।

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ যার তখনো প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ও বিডিআর সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি, সেই দুর্বলতম সময়েও যে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিলেন ('বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বলতম কূটনৈতিক পদক্ষেপ' শীর্ষক আমার কলাম ২৮ জুন নয়া দিগন্ত) সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বের মহাজোট সরকার কি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে এমনই অসহায় যে বিএসএফ'র দফায় দফায় গুলিবর্ষণে এত বাংলাদেশী নিহত হওয়ার পরও একজন বাংলাদেশী নিহত হওয়ার জন্য মহাজোট সরকার প্রতিবেশীর কাছে একটি 'ফর্মাল প্রটেস্ট' (কূটনৈতিক পরিভাষা) পেশ করতে পারল না! নিজ দেশের নাগরিককে হত্যা করার জন্য এই আগ্রাসী প্রতিবেশীর কাছে সরকারিভাবে প্রতিবাদটুকু করার অধিকারটুকুও কি সরকার হারিয়ে বসেছে! নাকি তারা ধরে নিয়েছে যে হতাহত বাংলাদেশীদের প্রত্যেকেই গুলি খেয়ে মরার মতো অপরাধ করেছিলেন এবং তাদের ওপর গুলিবর্ষণকারী বিএসএফ সদস্য এবং ভারতীয় বেসামরিক নাগরিক প্রত্যেকেই হচ্ছে নিষ্পাপ 'ধোয়া তুলসীপাতা'!

ভারতের অন্য প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, যার সাথে ভারতের নিবিড় মৈত্রী চুক্তি নেই যেমন আছে বাংলাদেশের সাথে, সেখানে ভারত-পাকিস্তান দীর্ঘ সীমান্তে গত ১৮ মাসে ভারতীয় বিএসএফ কি এভাবে দফায় দফায় গুলিবর্ষণ করে ১০৪ জন পাকিস্তানি নাগরিক হতাহত করার দুঃসাহস দেখাতে পারত? কৌটিল্য শাস্ত্রের উদ্ভাবক চাণক্যের দেশ ভারত 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম' নীতি অনুসরণে শক্তিশালী পাকিস্তানের প্রতি সম্ভ্রমশীল এবং 'নরম' বাংলাদেশের প্রতি যমের মতোই আচরণ করছে। কিন্তু দুর্বলেরও সহ্যের একটি সীমা আছে। অত্যাচার যখন সেই সীমা অতিক্রম করে, দুর্বলও রুখে দাঁড়ায় এবং দুর্বল যখন রুখে দাঁড়ায় সে প্রাণপণ করে দাঁড়ায় বলে অদম্য হয়ে যায়। তখন কুশাসকের আসন টলে ওঠে। তারই আলামত দেখাল সিলেটের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট উপজেলা সীমান্ত এলাকার বাংলাদেশী জনগণ।

৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র সশস্ত্র সহায়তায় ভারতীয় নাগরিকদের অনুপ্রবেশ, ভূমি জবরদখল এবং বাংলাদেশীদের ওপর গুলিবর্ষণ ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেরাই লাঠিসোটা নিয়ে প্রতিরোধ করে এবং অনুপ্রবেশকারীদের হটানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয়ার অভিযোগে বিডিআর বাঙ্কারের ওপর আক্রমণ করে ভাঙচুর করে। এরপরের কর্মসূচিতে স্থানীয় জনসাধারণ প্রধান সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারপরই লাচার হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী টুকু ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে বৈঠক করে কিছু মিঠা কথা আদান-প্রদান করেন। কিন্তু সেই বৈঠক যে লোক দেখানো ভড়ং এবং নিষ্ফল ছিল তা প্রমাণিত হলো যখন এর ২৪ ঘন্টা পরই রাজশাহী সীমান্তে বিএসএফ গুলিবর্ষণ করে আরেকজন বাংলাদেশীকে হত্যা করল।

যে সরকারকে তার স্বদেশেই তার দলের অধীন সংগঠন এবং তার সরকারের অধীন সংস্থা তোয়াক্কা করে না, সেই সরকারকে শক্তিধর প্রতিবেশী দেশ তোয়াক্কা করবে কেন? যে ছাত্রলীগ প্রায় পাঁচ দশক আগে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রের সংগ্রামে সম্মুখ শক্তিরূপে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ১৮ মাসেই সেই ছাত্রলীগ শুধু এক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৩টি বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়েছে, যেগুলোতে গুলিবর্ষণে একাধিক ছাত্র আহত হয়েছে, চার তলা থেকে ১০ ছাত্রকে ফেলে দেয়াসহ আরো অকল্পনীয় নৃশংসতার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগকে দমন করতে না পেরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগে তার দায়িত্ব থেকে সরে গেলেন।

প্রশ্ন আসে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ছাত্রলীগ সদস্যরা কেন এত হিংস্র, ক্ষমতালিপ্সু এবং জিঘাংসাপূর্ণ কর্মকান্ডে লিপ্ত হলো? প্রায় ২৪০০ বছর আগে ভারতে মহামতি সম্রাট অশোকের বাণী থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক বলেছেন, দেশের শাসককে অবশ্যই সৎ ও ন্যায়বান সুশাসক হতে হবে। সুশাসকের সুশাসনের বাতাস প্রজাদেরও সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে অনুপ্রাণিত করে। আর শাসক যদি অসৎ, ন্যায়নীতিহীন ও স্বার্থান্বেষী হয়, দেশে দুঃশাসনের ছায়া নেমে এসে প্রজাদের মধ্যে অসৎভাব, ন্যায়নীতি ও আইনের প্রতি অবজ্ঞাভাব এবং জিঘাংসা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা সঞ্চারিত হয়।

এ থেকে বোদ্ধা পাঠক-পাঠিকা বুঝে নেবেন, ছাত্রলীগের এ চরম চরিত্রনাশের মূল কারণ কোথা থেকে উৎসাহিত হয়েছে। বর্তমানের নীতিহীন, চরিত্রহীন ও স্বার্থান্ধ ছাত্রলীগের সব দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগ ছিন্ন করেছে বলে নেতানেত্রীরা বিবৃতি দিচ্ছেন। কিন্তু এটা যে কত বড় মিথ্যাচার তা প্রমাণ হলো যখন ৬ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন মিডিয়াকে বললেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ সদস্যদের গ্রেফতার করার জন্য তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তার একথা থেকেই প্রমাণ হলো তার নির্দেশ ছাড়া পুলিশ কোনো ছাত্রলীগ সদস্যকে গ্রেফতার করতে পারে না অর্থাৎ ছাত্রলীগ এখনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পূর্ণ প্রটেকশনে চলছে। ছাত্রলীগের কর্মকান্ডের দায়দায়িত্ব থেকে আওয়ামী লীগ সরল কোথায়?

সে দিন ঢাকায় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা হাসি হাসি মুখে মিডিয়াকে বললেন, শিবির কর্মীদের রাস্তায় ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটানোর ব্যাপারে জামায়াত নেতা মাওলানা নিজামী নিয়ন্ত্রণ করেননি এবং যারা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি বিধায় মাওলানা নিজামীর এসব অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে। তা-ই যদি হয়, ছাত্রলীগের এত সব গুলিবর্ষণ, ছাত্রহত্যা ও অন্যান্য অপরাধ ঘটনার জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে আওয়ামী লীগ নেতাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হচ্ছে না কেন?

মহাজোটের মহাশাসনকালে আদর্শের চূড়া থেকে নরকে পতিত ছাত্রলীগের প্রতিচ্ছায়ায় দেশের পুলিশ বাহিনীও একটি অপরাধমুখী বেপরোয়া সংস্থায় পরিণত হওয়ার অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মহাশাসন আসার পর আমি লিখেছিলাম কিভাবে সেনাবাহিনীকে নিঃশক্তি করার দিকে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে (২ সেপ্টেম্বর '০৯ নয়া দিগন্তে প্রকাশিত 'এখন কি সেনাবাহিনীকে নিঃশক্তি করার পদক্ষেপ' শীর্ষক আমার কলাম) এবং এরপর প্রকাশিত ২৬ অক্টোবর '০৯ নয়া দিগন্তে প্রকাশিত 'প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা' শীর্ষক আমার কলামে প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম।

আমার এ হুঁশিয়ারির যথার্থতা প্রমাণ হলো যখন দেখি পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে বিপাকে পড়েছে পুলিশের হাইকমান্ড যা প্রশাসনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চেইন অব কমান্ড। ৭ জুলাই নয়া দিগন্তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ না পেয়ে মানুষ হত্যা ও নিরপরাধ মানুষকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া, টাকা নিয়ে আসামিকে ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি ধরনের সব কর্মকান্ডের অভিযোগে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অনেক পুলিশ সদস্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আমাদের স্মরণে এ দেশে ইতঃপূর্বে আর কখনো পুলিশের বিরুদ্ধে এমন দুর্নীতি, দুরাচারের পাইকারি অভিযোগ পাওয়া যায়নি। পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনজনিত একাধিক মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আইনমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু না ঘটানোর জন্য হাইকোর্ট উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাকে তাদের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

দেশের আইন, ন্যায়নীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর পর মহাজোট সরকার এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে এতই আত্মবিশ্বাসশূন্য এবং আশঙ্কায় পড়েছে যে, বিরোধী দলের এক ঘন্টার শান্তিপূর্ণ অহিংস মানববন্ধন কর্মসূচিকেও তারা তাদের অস্তিত্বের প্রতি চরম হুমকি মনে করে পুলিশ দিয়ে হামলা চালিয়েছে! শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিবাদরূপে বিশ্বে স্বীকৃত মানববন্ধনের ওপর হামলা চালিয়ে মানববন্ধন ভেঙে দেয়ার প্রথম নজির বাংলাদেশের মহাজোটের মহাশাসন বিশ্বকে দেখাল! এই অচিন্ত্যপূর্ব কর্মকান্ড দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিবেশী দেশটিতে প্রায় একই সময়ে বামপন্থী দলগুলোর আহ্বানে নীরবে শান্তিপূর্ণ ১২ ঘন্টা 'ভারত বন্ধ' পালিত হলো। সেখানে সরকার 'ভারত বন্ধ' পালনকারীদের ওপর পুলিশকে লেলিয়ে দেয়নি, কোনো সংঘর্ষও হয়নি। এ থেকে অন্তত প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু সবক নেয়ার মতো মাথা ও মনোবৃত্তি কোনোটাই মহাজোট নেতাদের নেই বোঝা যায়। হলেখক ঃ প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট

মন্ত্রীর মুখে বিপজ্জনক কথা!

রইসউদ্দিন আরিফ

যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে জনমত গঠনের এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সরকারের বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী দেশবাসীকে এক দারুণ বার্তা দিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি ছাত্রলীগকে নিজেরা মারামারি না করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা পরিচালনার 'বিজ্ঞোচিত' পরামর্শ প্রদান করেছেন। তার এই 'অমৃত ভাষণ' লাখ লাখ মানুষ টেলিভিশনে শুনেছেন এবং খবরের কাগজে দেখেছেন।

মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দু'টি বিষয় এখন খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমটি হলো, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ঊনচল্লিশ বছর পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়কে এখনো সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তা না হলে দেশের জনগণ যেখানে ঊনচল্লিশ বছর যাবৎ যুদ্ধাপরাধের বিচারের অপেক্ষায় দিনক্ষণ গুনছে, সেখানে যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে আজ নতুন করে 'জনমত' গঠনের প্রয়োজন দেখা দেবে কেন? কোনো বিরোধী দল কি যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করছে? না, বিরোধী দল বরং যুদ্ধাপরাধের বিচার যাতে কোনো দলের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে হয় তার দাবি জানিয়ে আসছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে সরকারের উদ্দেশ্য কি তথাকথিত 'জনমত' গঠনের নামে যুদ্ধাপরাধের বিচারে কালক্ষেপণ করা এবং যুদ্ধাপরাধ ইস্যুকে ঝুলিয়ে রেখে আরো দীর্ঘদিন দলীয় রাজনৈতিক ফায়দা লোটা?

আর দ্বিতীয় বিষয়টি খুবই ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক, যা আওয়ামী লীগ নেতা নিজেই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় ছাত্রলীগকে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করার পরামর্শ দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশ শুধু তাদেরই দলের একার সম্পত্তি, তাই এ দেশে কেবল তাদেরই ক্ষমতায় থাকার অধিকার আছে। অন্য আর যারা আছে তারা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে যা যা করবে, অন্য সবাইকে তা চোখ বুজে মেনে নিতে হবে। কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলে, প্রতিবাদ করলে দলীয় গুন্ডাবাহিনী দিয়ে তাদের শায়েস্তা করা হবে। আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা সে রকম বার্তাই পেলাম কি না তা সবাই একবার ভালো করে ভেবে দেখুন।

ক্ষমতাসীনদের বর্তমান আচরণের মধ্যে আরেকটি 'বাতিক' প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেটি হলো সরকার এক শ' একটা অন্যায় কাজ করলেও (এমনকি তা যদি দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী, অস্তিত্ববিরোধী কাজও হয়) তার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে যুদ্ধাপরাধের বিচারে বাধা প্রদান হিসেবে গণ্য করার বাতিক। সম্প্রতি বিরোধী দল হরতাল ডেকেছিল সারা দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির তীব্র সঙ্কট, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অগ্নিমূল্য, সরকারি দলের লোকদের দুর্নীতি-টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজি-দলীয়করণ, বিরোধী দলের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক নিপীড়ন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ইত্যাদি ইস্যুতে। এ ধরনের অথবা এর চেয়েও অনেক কম গুরুতর ইস্যুতে আওয়ামী লীগও বিরোধী দলে থাকতে বহুবার হরতাল করেছে। কিন্তু আজকের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের হরতালকে যুদ্ধাপরাধের বিচার বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করছে। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলের এক ঘন্টার মানববন্ধন কর্মসূচিকেও সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচার বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হিসেবে অভিহিত করে পুলিশ-র‌্যাব দিয়ে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন বানচাল করে দিয়েছে। অথচ বিরোধী দল মানববন্ধনের কর্মসূচি নেয় হরতালে গ্রেফতারকৃত তাদের দলীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে, যার মধ্যে যুদ্ধাপরাধের বিচারের কোনো নামগন্ধ নেই।

সরকার অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জামায়াতের তিন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করেছে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার হাস্যকর অভিযোগে এবং রাস্তাঘাটে গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশের কাজে বাধা প্রদানের মতো ঠুনকো অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। এসবের মধ্যেও যুদ্ধাপরাধের কোনো নামগন্ধ নেই। সেই নেতাদের মুক্তির দাবিতে জামায়াতের প্রতিবাদ, মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচিকেও সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচার নস্যাৎ করার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। সরকারের এহেন কার্যকলাপ আপাতদৃষ্টিতে 'আনাড়িপনা' মনে হলেও এর উদ্দেশ্য বলতে হয় খুবই সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক।

তাই এটা আজ পরিষ্কার যে, সরকারের যুদ্ধাপরাধের বিচারের কথা জনগণের মনভোলানোর জন্য ফাঁপা তর্জনগর্জন মাত্র। আসলে সরকার তাদের দেড় বছরের দেশ শাসনে ব্যর্থতা ঢাকার জন্য যুদ্ধাপরাধ ও জামায়াত ইস্যুকে ব্যবহার করছে মাত্র। সর্বোপরি সরকারের একজন মন্ত্রী এবং সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তি যখন ছাত্রলীগকে নিজেরা মারামারি করে হিম্মতের অপচয় না করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার প্রকাশ্য উসকানি দেন, তখন পরিষ্কার বোঝা যায় দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে যুদ্ধাপরাধের বিচার নয়, বরং যুদ্ধাপরাধ ইস্যুকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার মাধ্যমে দেশে একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করাই হচ্ছে এ সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।